Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 30-37
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিশ শতকে ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে গান্ধিবাদী আদর্শ

Md Alauddin
Research scholar, Visva-Bharati, Department of Bengali, West Bengal, India

Abstract

A wave of nationalism in 19th century swept entire India including Bengal and our country got freedom in the 20th century through so many political ideals and movements. In the beginning, Tarasankar was associated with the congress, but later on he moved away, a significant change took place in politics. He wanted to serve the country through his service in literature. Rabindranath and Gandhiji were role models to him. He projected Gandhi's ideals through the character Sitaram in 'Sandipan Pathsala'. Tarasankar upholds his own life behind the projection of Shibnath in 'Dathri Devata' and here he expresses doubts regarding the win of freedom by a few urban people. Shibnath is sent to prison for supporting India's freedom through non-violence. Debu Ghosh in 'Ganadevata' and 'Panchagram' is the believer of Gandhism. There is a conflict between Marxism and Gandhism in the supporter of marxism, whereas Gourikanta upholds the values of Gandhism. Tarasankar was not against marxism, but the conflict lies in its way and method and that is why he wanted to mingle and merge the national heritage and Indian heritage together, but in vain.

Key words: Nationalism, Marxism, Gandhism, Non-violence, Indian heritage etc.

সমকাল ও সমকালের রাজনীতি মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। সাহিত্যিকদের জীবনও সেদিক থেকে ব্যতিক্রম নয়। সাহিত্যিক যেখানে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকেন, সেখানে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শটি হয়ে ওঠে খুব স্পষ্ট। বিশ শতকে ভারতে নানা রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চলেছে দেশ স্বাধীনের কাজটি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনে কংগ্রেস রাজনীতির সাথে যুক্ত থেকেছেন বহু বছর। জীবনের প্রথম দিকে শ্রেণিহীন সমাজ গড়ার স্বপ্নে বিপ্লববাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেই সেই হিংসার পথ থেকে সরে এসে অহিংসার পথে যুক্ত হয়েছেন আর বিশ্বাস করেছেন, **"ভারতবর্ষে বিপ্লব হবে, কিন্তু সে হবে অহিংস বিপ্লব।"**[১] রাজনৈতিক আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন তাঁর কাছে সব থেকে বড় আদর্শ। শুধু রাজনীতি নয়, গান্ধীজীর অর্থনৈতিক ও সমাজতন্ত্রবাদ ভাবনা তারাশঙ্করের মনকে প্রভাবিত করেছিল গভীর ভাবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত একজন কালের কথাকার। উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে তিনি দেশ ও কালের কথা বলেছেন। বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্য। গ্রামীণ জীবন ও অঞ্চলের মধ্যেই তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ রূপ ও তার ঐতিহ্যকে।

উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং আরও পরে বিশ শতকে যে বিপ্লববাদী আন্দোলন ও নানা রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল গ্রামীণ অঞ্চলেও। বিশ শতকে সমাজ ও সভ্যতা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে চরমভাবে বিবর্তিত হয়ে গেছে, সেই বিবর্তনের ভাষ্যরূপ পাওয়া যায় তাঁর গ্রন্থগুলিতে। রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সাম্যবাদী আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলন,কৃষকপ্রজা পার্টির রাজনীতি, মুসলিম লীগের রাজনীতি প্রভৃতির রাজনীতির মাঝে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় রাজনীতিতে আস্থাশীল থেকে গান্ধীবাদী আদর্শ ও তাঁর দ্বারা চালিত রাজনৈতিক আন্দোলন কে সমর্থন করেছেন ও শেষ পর্যন্ত সেই নীতিতেই তিনি স্থির থেকেছেন। গান্ধীজীর মতোই গ্রামের পুনর্গঠন ও পুরনো গ্রামীণ ঐতিহ্য কে টিকিয়ে রেখে অহিংসার মধ্য দিয়ে গণচেতনা ও গণআন্দোলন গড়ে তোলায় বিশ্বাসী ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচীর সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তাঁর জীবনে দেশপ্রেমের বহ্নিকণা জেগে ওঠে। পরাধীন দেশ কে স্বাধীন করার সংকল্পে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে আসক্তি ছিল না তাঁর। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস বা অসহযোগ আদর্শ তাঁর মন কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গান্ধীজীর আদর্শে আন্দোলন করার জন্য তিনি জেলে গিয়েছিলেন। স্রষ্টা তারাশঙ্করের বিভিন্ন সৃষ্টিতে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের বিভিন্ন দিকগুলি ধরা পড়েছে খুব স্পষ্টভাবে। জেলে বসে লেখা 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৩৩৮) উপন্যাসে শিবকালী বাবু ও সুরেনবাবুর মধ্যে দেখা গেছে গান্ধীবাদী আদর্শ। উপন্যাসে জমিদার ও পুঁজিপতিদের দ্বারা কৃষক ও শ্রমিকদের শোষণ ও অত্যাচারের রূপটি ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। জমিদারের অত্যাচারে কৃষক গোষ্ঠ গ্রাম ছেড়ে পরিবার সহ একটি ছোট শহরে এসে কলকারখানায় কাজ নিয়েছে। কিন্তু সেখানেও মিলেছে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার। আন্দোলনে সে প্রাণ হারিয়েছে। ছোট মিস্ত্রীর মতো মানুষের শিবকালী ও সুরেনবাবুদের মতো গান্ধীজীর শিষ্যদের আদর্শের প্রতি বিশ্বাস নেই। সে বলে **" বিশ্বাস আমি কাউকে করিনে, সে চেলাই হোক আর ফেলাই হোক। আমাদের ভাতে মারে, আমরা হাতে মারব – এই বোঝাপড়া হয়, রাজি আছি।"**[২] এরা অহিংসা নয়, হিংসার আন্দোলনে এরা বিশ্বাসী। উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে শিবকালী বাবু বলেছেন , **" চৈতালীর ক্ষীণ ঘূর্ণি, অগ্রদূত কালবৈশাখীর।"**[৩] আবার উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কে। বাংলার যৌবন শক্তির প্রতীক ও নবযুগের অগ্রদূত সুভাষচন্দ্র সংস্পর্শে এসেছিলেন আর তাঁর আদর্শে মুগ্ধও হয়েছিলেন তিনি একসময়ে। তাই প্রথমদিকে তিনি যে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন সেই দিকটি উপন্যাসে উঠে এসেছে। শিবকালী বাবুর মতো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করেছিলেন কালবৈশাখীর মতো বিপ্লবী আন্দোলনের তাণ্ডবে দেশ থেকে সমস্ত প্রকার শোষণ ও অত্যাচার দূর হবে। গোষ্ঠের গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ ও শ্রমিক আন্দোলনে উপন্যাসটি শেষ হওয়ায় কোন কোন সমালোচকের চোখে উপন্যাসটিতে মার্কসবাদের প্রভাব ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> কিন্তু মার্কসের ক্যাপিটাল বা তাঁর লেখা কোনো বই আমি পড়িনি। এদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদের উপর লেখা প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়েছি মাত্র। আমার সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ; তা থেকেই আমি আমার উপলব্ধিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। ... হাজার হাজার বৎসর মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। উনশশো ষোলো –সতেরো সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ – একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সেদিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশবিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম ; সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখানকার গুমোটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে। এর জন্য মার্কসবাদ পড়তে হয়নি আমাকে। তবে মার্কসবাদের একটি তত্ত্ব অভিনব। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে এইটুকু জেনেছি। এদেশে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধের মধ্যে একটি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, যেটি ভারতীয় সত্যের সঙ্গে সমন্বিত

> হওয়ার অলঙ্ঘনীয় দাবি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি। সেই শক্তি যে কেমনভাবে ঠেলে নিয়ে চলেছে মানুষের সমাজকে, মানুষকে, সেই সত্যকে প্রবন্ধ মারফত জেনেছিলাম প্রথম – তারপর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেখানকার সামাজিক উত্থানপতনের ইতিহাস সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখে উপলব্ধি করেছিলাম এই তত্ত্বকে।[৪]

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তাতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছিলেন যে একদিন গণআন্দোলনের ঝড় উঠবেই তা মার্কসবাদী রাস্তা ধরেই হোক আর গান্ধীবাদী পথেই হোক। কিন্তু 'ধাত্রীদেবতা' রচনার আগে পর্যন্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মধ্যে গান্ধীবাদী আদর্শটি খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবনাথের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর নিজের জীবন ও রাজনীতিক্ষেত্রে দ্বিধা দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। প্রথম দিকে শিবনাথ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত হলেও পরে সে পথ ত্যাগ করেছে, গান্ধীজীর অহিংস আদর্শে উদবুদ্ধ হয়েছে। অহিংসায় সে বিশ্বাস করে, প্রত্যাশা করে গণআন্দোলন, বিশ্বাস করে সে মানুষকে। সুশীলদের সশস্ত্র আন্দোলনে তার কোনরকম আস্থা নেই। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর মতো তিনিও বুঝেছেন যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসবেনা, এর জন্য চাই গণজাগরণ ও গণআন্দোলন। সাধারণ মানুষের কর্মপ্রচেষ্টায় গণআন্দোলন সফল হবে কিনা তাতে সন্দেহ থাকলেও, সে দেখেছে পৃথিবীর সকল দেশে বিপ্লব ঘটে চলেছে, রাশিয়ায় স্বৈরাচারতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়েছে গণবিপ্লবের কালবৈশাখীর ঝড়েতে। ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালা বাগের মাটি রক্তে ভিজে গেছে। কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ ও নাগপুর কংগ্রেসের ফলে ক্ষীণ ঘূর্ণির মতো অহিংসা ও সত্যের মূল মন্ত্র অসহযোগ আন্দোলন জেগে উঠেছে। কিন্তু চারিদিকে সে দেখেছে শূদ্র আর শূদ্র। মাতৃদেবতার পূজার অধিকার যে তাদের আছে তা তারা জানে না আর আসেও না। শিবনাথ তাদের উদ্বুদ্ধ করে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির কাজে।কিন্তু যেখানে গ্রামে নব্বই শতাংশের বেশি মানুষ বাস করছে, তাদের বাদ দিয়ে এই গণআন্দোলন কখনই সম্ভব নয়। তাই পল্লীর এই সাধারণ মানুষদের দুঃখ দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য শিবনাথ জমিদার থেকে হয়েছে কৃষক। ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে সাধারণ মানুষের সাথে কৃষিক্ষেত্র নিয়ে মেতে উঠেছে, **"চরের ওই কৃষিক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করিয়া একে একে পাঁচ –সাতখানি গ্রামে তাহার প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। নাইট স্কুল,জন তিনেক হাতুড়ে ডাক্তার লইয়া তিনটি ডাক্তারখানা, দুইখানা গ্রামে বহু চেষ্টায় দুটি ধর্মগোলাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"**[৫] চরকা ও তাঁত প্রবর্তন করেছে। গ্রামে গ্রামে সমবায়-ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। সে কল্পনা করে যে একদিন এই সাধারণ মানুষের দল গণআন্দোলনকে সফল করবে। একসময় দেশের মুক্তির জন্য বিদেশি জিনিস বয়কট ও সরকারের সাথে অসহযোগিতা করার জন্য পল্লীর সাধারণ মানুষদের উদ্বুদ্ধ করে।

> ... তোমরা ভয় করছ কেন? তোমরা জাননা, আজ দেশের সমস্ত ভারতবর্ষের দিকে দিকে – চারিদিকে হাজার হাজার জোয়ান ছেলে জেলে চলেছে, সমাজের যারা মাথার মণি তারা হাসিমুখে যাচ্ছেন জেলে। কেন? দেশের মুক্তির জন্য, তোমাদের মুক্তির জন্য। সোনার দেশ শ্মশান হয়ে গেল, আজও কি মদ খেয়ে বিভোর হয়ে পড়ে থাকবার সময় আছে, না ভয় করে স্ত্রীলোকের মত ঘরের কোণে বসে থাকবার সময় আছে ! আমাকে তোমরা ডাকছ, বলছ, পালিয়ে এস, ফিরে এস। কিন্তু আমি তোমাদের ডাকছি, তোমরা আর ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে থেকোনা, বেরিয়ে এস, দেশের কাজে স্বরাজের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়। বিলিতী কাপড়, বিলিতী জিনিস পোরোনা, মদ খেয়োনা, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা কোরো না।[৬]

বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলে গণজাগরণ ও গণআন্দোলনের ঢেউ তোলে আর শেষে শিবনাথের জেল হয়। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বা গণআন্দোলনে শিবনাথ চরিত্রে রোমান্স বা কল্পনা প্রাধান্য পেলেও, তারাশঙ্করের দেশপ্রেম বা দেশসেবা ভাবনার সাথে গান্ধীবাদী আদর্শটি খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসে।

'গণদেবতা' (১৩৪৯) ও 'পঞ্চগ্রাম' (১৩৫০) উপন্যাসে দেবুর মধ্য দিয়ে স্রষ্টা তারাশঙ্কর গান্ধীবাদী আদর্শের দিকটি তুলে ধরেছেন। গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের সাথে সাথে গ্রামীণ পুরনো ঐতিহ্যের ভাঙ্গনের পাশাপাশি গণজাগরণ ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার কথা তুলে ধরেছেন। বিশ্বনাথের মতো কমিউনিস্টদের লড়াই একালের সাথে। একালকে শেষ করে তারা আগামীকাল কে নিয়ে আসতে চায়। এই কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের এই পরমৈশ্বর্য যদি যুক্ত করতে পারতেন এই পণ্ডিতেরা, রাজনৈতিক দার্শনিকেরা, তবে পৃথিবীর জীবনদর্শনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোজিত হত। রাশিয়াকে বুঝি, চিনকে বুঝি, জানি সেখানে এ অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই আমার। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাশ্চাত্যমতের পণ্ডিতদের মতো আমি বুঝি না, কিন্তু ভারতীয় মতে বুঝি।[৭]

জমিদার ও পুঁজিপতিদের সাথে হিংসার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষক শ্রমিকদের মূল্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তারা। কিন্তু দেবুর ভাবনা বা পরিকল্পনা তা নয়। অহিংসার মধ্য দিয়ে সে দুই শ্রেণির মধ্যে এক সু সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। শিবনাথের মতো দেবুরও বিশ্বাস যে পল্লীউন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য দূর হলে গণচেতনা গড়ে উঠবে ও গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা আসবে। গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর জেল হয়েছে। জেল থেকে ফিরে এসে দেবু দেখেছে যে গ্রামের মানুষেরা রাজনীতি ক্ষেত্রে ভিন্ন পথে পা মিলিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি কাজে লেগেছে। পঞ্চগ্রামে কংগ্রেস রাজনীতির পাশাপাশি চলেছে কৃষক সমিতি ও মুসলিম লীগের রাজনীতি। জগন ডাক্তার, গৌর এরা কংগ্রেস রাজনীতিতে থাকলেও দৌলত সেখ মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছে আর ইরসাদের মতো মানুষেরা যোগ দিয়েছে কৃষক সমিতিতে। তাই শিবনাথের আবেগ ও কল্পনার মধ্য দিয়ে আদর্শ গ্রাম ও গণজাগরণ গড়ে উঠলেও, দেবুর স্বপ্নে দেখা সেই আদর্শ গ্রাম গড়ে ওঠেনি এবং জাতীয় ঐক্য আন্দোলনও রূপ পায় নি। পঞ্চগ্রামে দেবুর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। ভারতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক মতাদর্শে ভারতে জাতীয় ঐক্য গড়ার কাজে গান্ধীজীর মতোই দেবুর স্বপ্নভঙ্গ ও ব্যর্থতা দেখা গেছে। তবুও উপন্যাসের শেষে পঞ্চগ্রামকে ঘিরে পরিকল্পনার কথা দেবু তার স্ত্রীকে জানিয়েছে :

> তাহার নিজের কথা, পঞ্চগ্রামের কথা, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সেই পুরানো কথা। নূতন যুগের আমন্ত্রণ নূতন ভঙ্গিতে, নূতন ভাষায়, নূতন আশায়, নূতন পরিবেশে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যভরা ধর্মের সংসার। ... পঞ্চগ্রামের প্রতিটি সংসার ন্যায়ের সংসার, সুখ স্বাচ্ছন্দে ভরা, অভাব নাই, অন্যায় নাই, অন্নবস্ত্র - ঔষধপথ্য, আরোগ্য, স্বাস্থ্য, শক্তি, সাহস অভয় দিয়া পরিপূর্ণ উজ্জ্বল। আনন্দে মুখর, শান্তিতে স্নিগ্ধ। দেশে নিরন্ন কেহ থাকিবেনা, আহার্যের শক্তিতে - ঔষধের আরোগ্যে নীরোগ হইবে পঞ্চগ্রাম, মানুষ হইবে বলশালী, পরিপুষ্ট, সবল দেহ - আকারে তাহারা বৃদ্ধি লাভ করিবে, বুকের পাটা হইবে এতখানি, অদম্য সাহসে নির্ভয়ে তাহারা চলাফেরা করিবে। নূতন করিয়া গড়িবে ঘর দুয়ার, পথঘাট।[৮]

চল্লিশের দশকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী সাহিত্য ও শিল্প সংঘে যোগ দিয়ে অনেক কম্যুনিস্ট লেখক ও বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছেন। এইসময়ে রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের তৎপরতাকে দেখেছেন তিনি। যুদ্ধের ঘাত প্রতিঘাত ও মন্বন্তরে যখন একদল ক্ষুধায় কাতর হয়ে নিজেকে বিক্রি করে দিচ্ছে, সেই দুর্ভিক্ষ ও

দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যের জন্য কম্যুনিস্ট কর্মীদের প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। তাই মার্কসবাদ বিরোধী মত নয়, তাদের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে ছিল তাঁর মতবিরোধ। তিনি বলেছেন, **"মার্কসবাদসম্মত সমাজ পরিকল্পনা পৃথিবীর শাস্ত্রে একটি মহত্তম আবিস্কার। সে সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান তাঁদের কাছে পেয়েছি। এর কথা আগেই বলেছি। এই কল্পনা রূপায়নের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আমার সঙ্গে মতবিরোধ।"**[৯] 'মন্বন্তর' (১৩৫০) উপন্যাসে বিজয় নামে যে কম্যুনিস্ট চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তিনি নাস্তিকতা, বস্তুসর্বস্বতা বা প্রাদেশিকতায় বিশ্বাসী নয় বরং জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী অহিংসাবাদের সুর শোনা যায়। দেশমাতার স্বাধীনতার কাজে যৌবন কাল থেকেই তিনি যুক্ত হয়েছেন। ১৯১৬ সালে কলেজে প্রবেশ করে তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছেন। ১৯২১ সালে তিনি এম.এ পড়াশোনা মুলতুবী রেখে গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জেলে গিয়েছেন। ১৯৩০ সালে আবার গণআন্দোলনের সময় তিনি গ্রেপ্তার হন। বর্তমানে তিনি একজন সাম্যবাদী –কমিউনিস্ট হলেও উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন :

> পৃথিবী যাই বলুক, ভারতের চিরন্তন সাধনার ধারা জয়যুক্ত হয়েছে, বশিষ্ঠের পুণ্যফল আজও নিঃশেষিত হয় নি। অস্তায়মান সূর্যের শেষ রশ্মির মতো মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এ যেন বর্ণশোভার মহাসমারোহ ঘটে গেল। সত্য হল জয়যুক্ত। আত্মদহনের হোমশিখা তাঁকে দহন করে নি, সে শিখা তার দীপ্তিতে জ্যোতিতে পরিণত হয়েছে।... তুমি দীর্ঘজীবী হও মহাত্মা –মিথ্যার বিলুপ্তিতেই সত্যের প্রকাশ, ভয়কে সে জয় করেছে চিরদিনের মত। তুমি দীর্ঘজীবী হও মহাত্মা –তুমি চিরায়ু লাভ কর। ভারতের সত্যধর্মের প্রতীক তুমি। মহা দুর্যোগে পৃথিবী আজ আচ্ছন্ন। দুর্যোগের অবসানে সত্যসূর্যের আলোকে আলোকিত দিনের প্রত্যাশা রয়েছে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ। এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ মহামন্বন্তর। এই মন্বন্তরে ওই পুণ্যফল আমাদের সর্বোত্তম ভরসা। আমাদের কর্মশক্তি সঞ্জীবিত হবে ওই পুণ্যে।[১০]

এর আগেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অহীন্দ্র (কালিন্দী) ও বিশ্বনাথ (পঞ্চগ্রাম) এর মতো কম্যুনিস্ট চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু বিজয়ের মতো চারিত্রিক বিবর্তন ওই চরিত্রগুলির মধ্যে দেখা যায় নি। বিজয় চরিত্রের স্রষ্টা তারাশঙ্কর নিজে একটি সময়ে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সাহিত্য ও শিল্পী সংঘে যোগ দিলেও জাতীয়তাবাদী আদর্শ বা গান্ধীবাদী আদর্শ থেকে সরে যান নি। তাই বিজয়ের মধ্যে তারাশঙ্করের রাজনৈতিক জীবন দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে মার্কসবাদের যে যোগ রাখার কথা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন, এক্ষেত্রে সেই আদর্শটি যুক্ত হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্র আদর্শ বা গান্ধীজীর আদর্শ এবং পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণের কারণটি কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ চিঠির আকারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে যা বলেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ।

> ...আপনি তো মূলত স্বদেশী রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোতে ভেসে নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের কাছে পৌঁছেছিলেন এবং খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা, গান্ধীজির আন্দোলনে সমাজে নিম্নবর্গীয়দের সংস্রব স্বাভাবিকই ছিল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়নের নিজস্ব পৃথক পন্থাও আপনাকে আকর্ষণ করেছিল। এছাড়া আপনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হ্রস্বকায় জমিদারি কাজকর্মের সূত্রেও নিম্নবর্গীয়দের সান্নিধ্যে কাতিয়েছিলেন। সত্যি বলতে কী, সাহিত্যে নিম্ন বর্গীয় মানুষজনের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল মুখ্যত বিশ-তিরিশের দশকের ওইসব রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই। ক্রমশ মার্কসীয় মতাদর্শও একই পরিপ্রেক্ষিতেই আপনাকে আকর্ষণ করেছিল। এই পারিপার্শ্বিক এবং পটভূমি আপনাকে অতীতের এবং আপনার সমকালের গণবিদ্রোহ ও গণআন্দোলন সম্পর্কে উদ্দীপিত করেছিল।[১১]

বিজয় ছাড়াও এই উপন্যাসে আরও তিনজন কমিউনিস্ট চরিত্রের চিত্র অঙ্কন করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কানাই, নীলা ও নেপী এরাও কমিউনিস্ট কর্মী। কমিউনিস্ট পার্টি করার জন্য পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে

তাদের জীবনাদর্শের সংঘাতের চিত্রটি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাদের আদর্শ, সরলতা ও কর্মপ্রবণতার দিক। অন্যদিকে আছে বিপ্লববাদে বিশ্বাসী গুনদাবাবুর মতো চরিত্র। তিনি আগে একজন শক্তিমান বিপ্লবী কর্মী ছিলেন, কিন্তু আগস্ট আন্দোলনের পর থেকে একজন নিছক দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্ত্রীও গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। তিনি অসুস্থ পুত্রের জন্য ঈশ্বরের কাছে দীর্ঘায়ু কামনা না করে গান্ধীজীর জন্য প্রাথনা করেছেন তাঁকে রক্ষা করার জন্য।

গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধীবাদী আদর্শের দিক রয়েছে 'সন্দীপন পাঠশালা'(১৩৫২) উপন্যাসে। রত্নহাটা গ্রামের জমিদার ধীরানন্দ ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হয়েছেন। গান্ধীবাদী আদর্শ সীতারামের মধ্যেও দেখা গেছে। ধীরানন্দ বাবুই পাঠশালার নামকরণটি করেছেন। গান্ধীজী সহ দেশের জাতীয়তাবাদী নেতাদের নাম ও আদর্শের শিক্ষা দেওয়া হয় পাঠশালাতে। তবে সীতারাম প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হয় নি। সাহস ও ভয় দুইয়ের মিশ্রণে দেখা গেছে তার স্বদেশপ্রেমের দিকটি। ২৬ শে জানুয়ারি দেবুদের তোলা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় লুকিয়ে প্রণাম করে আসে। অসম্ভব সাহস ও মনের শক্তি নিয়ে দেশের জন্য কারাবরণ এমন কি বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেওয়া যায়- এরকম কথায় তার চারিত্রিক দৃঢ়তাটি উঠে আসে। আবার স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের মতো মানুষের ক্ষমতা কতোটুকু - এরকম ভাবনাতেও সে ভাবিত হয়। তারা চরকা কিনবে,চরকা কাটবে বা নিজেরা সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করবে - এটুকু ছাড়া আর তাদের ক্ষমতা কতোটুকু? জেল থেকে তাকে ধীরানন্দ বাবুর পত্র পাওয়ার সময় তার ভয় ও আনন্দ একসাথে প্রকাশ পেয়েছে,

> একদিকে তার বুকের ভিতরটা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছে, অন্যদিকে আনন্দে গৌরবে তার চোখের জল আসছে। জেল থেকে ধীরাবাবু তাকে পত্র লিখেছেন - জেলখানার কর্তাদের সই করা পত্র। তাঁরা পাস করে দিয়েছেন। সীতারাম ভাবছে জেলখানা থেকে নিশ্চয়তার নাম আবার পুলিশের খাতায় গিয়েছে। হায় ধীরাবাবু কেন আপনি আমাকে এমন করে জড়াচ্ছেন। আমি গরীব, আমি সামান্য মানুষ, আমি কি আপনাদের সঙ্গে পথ চলতে পারি।[১২]

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে বা গণআন্দোলনে সীতারামের মতো মানুষের অন্তরের সমর্থন থাকলেও সাহস নিয়ে তারা প্রত্যক্ষরূপে এগিয়ে আসতে পারেনি। 'ধাত্রীদেবতা উপন্যাসে এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসে সীতারাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেই দিকটি আরও স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন তিনি।

ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, মতপার্থক্য ও মতাদর্শের মধ্যে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা, দেশভাগ ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কালান্তরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে 'কালান্তর' (১৩৬৩) উপন্যসে। কপিলদেব বিপ্লববাদ বা মার্কসবাদে বিশ্বাসী। রক্তবিপ্লবের মধ্য দিয়েই দেশের স্বাধীনতা আসবে, কালের পুরনো আদর্শে তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি বুঝেছিলেন বামপন্থী দলের বিপ্লব ছাড়া অন্য পথ নেই। দেশে যেভাবে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের অবনমন ঘটছে, তাতে তিনি চেয়েছিলেন যাতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা না বাধে। তিনি বিপ্লবকে এক সরলরেখায় চালাতে চেয়েছেন। তিনি বুঝেছেন যে সেখানে ধর্মাবেগ প্রবেশ করলে বিপ্লব হবে ব্যর্থ। কিন্তু, **"ছেচল্লিশ সালের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে জীবনের বৈপ্লবিক জীবনাবেগ ওই খাত দিয়ে বয়ে চলে গেল। ওর মধ্যে কপিলদেবের একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র আশ্বাস এই যে গান্ধীর অহিংসার সত্য মিথ্যা অলীক আকাশ কুসুমে পরিণত হয়েছে।"**[১৩] ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময়ে তিনি দল নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। এই আত্মঘাতী দাঙ্গার মোড় ফিরিয়ে তাকে বিপ্লবের খাতে বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চেষ্টা তার সফল হয়নি। বিভক্ত হয়েছে দেশ। গৌরীকান্ত গান্ধীবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর নেতৃত্বেই নবগ্রামে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। শান্তি গান্ধীজীর অহিংসা

আদর্শে প্রথমে বিশ্বাস না করলেও পরবর্তীকালে সে ভুল ভেঙ্গেছে। বিপ্লবের মধ্য দিয়েই দেশের স্বাধীনতা আসবে এই বিশ্বাস ক্রমে পাল্টে গিয়েছে, **"আমিও একদিন তাই ভাবতাম। মনে হত এ ভুল, এ ভুল। কিন্তু না। ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে যা বুঝতে পারিনি, এখানে এই নবগ্রামে ফিরে এসে তা বুঝলাম।"**[১৪] স্বাধীনতা পূর্বে দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলন বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে এই ঐক্য না থাকার জন্যই পরবর্তীকালে ঘটেছে দেশভাগ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাই সবসময় চেয়েছেন ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত করতে সব রাজনৈতিক মতাদর্শ কে। কিন্তু তা না হওয়ায় ভারতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মতপার্থক্য। তাই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ও দেশভাগের মতো পাপ কে রোধ করতে পারা যায় নি পরবর্তীকালে।

গান্ধীজীর মতো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পরাধীন ভারতে মার্কসবাদী আন্দোলনকে ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার পক্ষে ছিলেন। শুধু তাই নয় সেই সময়ে মুসলিম লিগ আলাদা স্বতন্ত্র পথে পথ হেঁটেছিল। সব রাজনৈতিক দলগুলিকে একই অভিমুখে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালিয়ে শেষে ব্যর্থ হয়েছিলেন গান্ধীজী। এই স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন অভিমুখে আন্দোলন প্রবাহিত হয়ে ব্রিটিশদের উচ্ছেদ ঘটেছে, কিন্তু তার সাথে সাথেই ঘটেছে দেশভাগ।

উল্লেখপঞ্জি:

১। আমার সাহিত্য-জীবন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০, চতুর্থ মুদ্রণ ৬ শ্রাবণ ১৪২২ ২৩ জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৮৭।

২। চৈতালী ঘূর্ণি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৯১, পৃষ্ঠা ৬৯।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৮২।

৪। আমার সাহিত্য-জীবন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৩ -৭৪।

৫। ধাত্রীদেবতা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৬।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৭।

৭। আমার সাহিত্য-জীবন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৭ -৩০৮

৮। পঞ্চগ্রাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রাগুক্ত, তৃতীয় মুদ্রণ ১৩৯১, পৃষ্ঠা ২৯৫ -২৯৬।

৯। আমার সাহিত্য-জীবন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৭।

১০। মন্বন্তর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৯১, পৃষ্ঠা ২৮৭ -২৮৮।

১১। মাননীয় তারাশঙ্কর সমীপেষু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, সম্পাদনা প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, সাহিত্য আকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃষ্ঠা ১০৬।

১২। সন্দীপন পাঠশালা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৮৯, পৃষ্ঠা ১১২।

১৩। কালান্তর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,কাত্যায়নী বুক স্টল, ২০৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৬৩,

পৃষ্ঠা ২৩৯।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৫।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। দে, অমলেন্দু, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ৬৭ প্যারিদাস রোড, ঢাকা -১১০০, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য -জীবন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০, চতুর্থ মুদ্রণ ৬ শ্রাবণ ১৪২২ ২৩ জুলাই ২০১৫।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, সম্পাদিত তারাশঙ্কর অন্বেষা, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৭।

৪। বসু, নিতাই, তারাশঙ্করের শিল্পিমানস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৪০৫/এপ্রিল ১৯৯৮।

৫। ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা ১৩, ১৫ ই আগস্ট ১৯৭২।

৬। ভট্টাচার্য, প্রর্দ্যুম্ন, সম্পাদনা তারাশঙ্কর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য আকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ ২০০১।

৭। মজুমদার, শ্রীরমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রাগুক্ত, তৃতীয় সংস্করণ ২০০০।

৮। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, প্রাগুক্ত, চতুর্থ সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৪১২ নভেম্বর ২০০৫।

৯। মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, সম্পাদনা তারাশঙ্কর সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে, রত্নাবলী, ১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৫/ কলকাতা বইমেলা ১৯৯৯।

১০। সাহা, পঞ্চানন, হিন্দু - মুসলমান সম্পর্ক : নতুন ভাবনা, বিশ্ববিক্ষা, ২৭ জি, কলেজস্ট্রীট, কলিকাতা -৭৩, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৭।